# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ২২ সংখ্যা | ১৯ - ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১


# প্রধানমন্ত্রীর ‘ইঞ্জিন’ ও শিল্পায়নের ভাঁওতা

‘ডবল ইঞ্জিন’ জুড়ে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। হলদিয়ায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, কেন্দ্র এবং রাজ্যে একই দলের সরকার (তাঁর ভাষায় ‘ডবল ইঞ্জিন’) না হলে উন্নয়ন হবে না। তাই রাজ্যের মানুষ উন্নয়ন চাইলে বিজেপিকেই জেতাতে হবে। এর মধ্য দিয়ে মোদিজি অন্তত দুটি অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন— এক, তাঁর ৭ বছরের রাজত্বে ভারতের বেশিরভাগ অংশের উন্নয়ন হয়নি। কারণ, ভারতের ২৮টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আছে মাত্র ৯টিতে (এ ছাড়া ৩টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয়েও মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার ধরে আছে, আর ৫টিতে অন্য দলের মুখ্যমন্ত্রীত্বে তারা সরকারের শরিক)। বাকি রাজ্যগুলির উন্নয়নের প্রশ্নে বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার কেমন আচরণ করে চলেছে প্রধানমন্ত্রীই তা বলে দিয়েছেন। দুই, বিজেপি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটিকে আদৌ পাত্তা দেয় না। বোঝা গেল, কখনও সংসদকে, কখনও সংবিধানকে প্রণাম করে গণতন্ত্রের পূজারি হওয়ার যে ভড়ং তিনি দেখান, সেটাও আসলে ভোটের জুমলা! প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারটাকে তিনি বিজেপির সম্পত্তি হিসাবে না দেখলে এমন কথা বলতে পারতেন কি? এরপরেও তিনি রাজ্যে রাজ্যে ভোটের প্রচার করতে গিয়ে গণতন্ত্র রক্ষার স্লোগান তুলবেন?

*বিজেপি সরকারের স্বৈরাচারী ও কৃষক বিরোধী কালা কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বর্ধমানে কৃষক সংহতি মিছিল*

*দুয়ের পাতায় দেখুন*

প্রধানমন্ত্রী হলদিয়াতে দাঁড়িয়ে বাংলার শিল্পায়নে ‘ইঞ্জিন’ জোড়ার স্লোগান দিয়েছেন। যদিও বিরাট ঢাকঢোল পিটিয়ে তিনি হলদিয়ার মঞ্চে যেসব প্রকল্পের শিলান্যাস অথবা উদ্বোধন করেছেন সেগুলি হল, একটা গ্যাসের পাইপলাইন, একটা জেটি আর একটা ফ্লাইওভার। শিল্প দূরে থাক, এর কোনওটাই কোনও নতুন বড় প্রকল্প পর্যন্ত নয়। শিল্পের নামে ফ্লাইওভার কিংবা জেটি উদ্বোধনের জন্য যখন কোটি কোটি টাকা খরচ করে প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ বিমানে উড়ে আসতে হয়, তাঁর রাজত্বে শিল্পের হাল কেমন, তা বুঝতে অসুবিধা হয় কি? এ দিকে আবার বিজেপি নেত্রী এবং হুগলির সাংসদ, তাদের রাজ্য সভাপতি, এমনকি সদ্য তৃণমূলের জামা বদলে

# প্রধানমন্ত্রীর আবদার ঃ শোষণ-বঞ্চনা চলুক, কিন্তু আন্দোলন চলবে না

সরকারের সব রকমের ভয়-ভীতি, পুলিশি অত্যাচার, গ্রেফতার, মিথ্যা অভিযোগে মামলা সব কিছুকে হেলায় তুচ্ছ করে কৃষক আন্দোলন তিন মাসে পৌঁছতে চলল। যে আন্দোলন দিল্লি সীমান্তে ধরনা দিয়ে শুরু হয়েছিল তা আজ ছড়িয়ে পড়েছে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সহ সারা দেশে। রাজ্যে রাজ্যে মহাপঞ্চায়েতগুলিতে কৃষকদের ভিড় উপচে পড়ছে। হরিয়ানা, পাঞ্জাবে বিজেপি নেতারা জনতার থেকে মুখ লুকোচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন দ্রুত বাড়ছে। আন্দোলনের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি দেখে ভয় পেতে শুরু করেছেন বিজেপি নেতারা। সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় সেই ভয়ই ফুটে বেরল। যে আন্দোলন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী এতদিন নিশ্চুপ ছিলেন, ভাবখানা ছিল এমন যেন আন্দোলন যে কিছু হচ্ছে তা তিনি জানেনই না— সেই আন্দোলনেরই নেতাদের তিনি ‘আন্দোলনজীবী’, ‘পরজীবী’ বলে যেন গায়ের ঝাল মেটালেন। প্রধানমন্ত্রী বোঝাতে চাইলেন, কৃষকরা আসলে কিছুই বোঝেন না। এই নেতারাই তাঁদের বিভ্রান্ত করছেন।

প্রধানমন্ত্রী আসলে খুব সচেতন ভাবেই আন্দোলনকারী কৃষক আর তার নেতৃত্ব, দুটিকে আলাদা করে দেখাতে চাইছেন। অথচ প্রধানমন্ত্রী খুব ভাল করেই জানেন, নেতৃত্ব ছাড়া কোনও আন্দোলনই হয় না এবং সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া কোনও আন্দোলন সফলতার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। আন্দোলন যদি নেতৃত্বহীন হয় এবং তা শুধুমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ থেকে গড়ে ওঠে, তবে তাকে দমন করাও সরকার তথা প্রশাসনের পক্ষে সহজ হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসে সরকারি ষড়যন্ত্রে আন্দোলনকারী কৃষকদের এক অতি ক্ষুদ্র অংশকে কাজে লাগিয়ে প্রশাসন গোটা আন্দোলনটাতেই কালি ছেটাতে চেয়েছিল। নেতৃত্বের বিচক্ষণতাতেই সরকার সে কাজে ব্যর্থ হয়। এই কঠিন সত্যটি প্রধানমন্ত্রী কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। তাই নেতৃত্বকে ‘আন্দোলনজীবী’, ‘পরজীবী’ প্রভৃতি বলে আন্দোলনকারী কৃষকদের থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করার এবং দেশের মানুষের সামনে তাঁদের আন্দোলনে বহিরাগত হিসাবে দেখানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী যা চাইছেন তা যদি সত্যি হত, যদি ভোটবাজ সংসদীয় দলগুলির টুইটারে গর্জনশীল নেতারাই কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকতেন, তবে হয়ত আন্দোলন দমন করতে প্রধানমন্ত্রীর সুবিধাই হত। কিন্তু কৃষক আন্দোলন তার মাটি থেকে লড়াইয়ের ময়দান থেকে নেতৃত্বের জন্ম দিয়েছে। চাইলেও তাই প্রধানমন্ত্রী আন্দোলন থেকে তাঁদের আলাদা করতে পারবেন না। ফলে

*সাতের পাতায় দেখুন*

# বাজেটে শিক্ষার সার্বিক বেসরকারিকরণের দাওয়াই

এবারের বাজেটে শিক্ষা খাতে ৬.১৩ শতাংশ বরাদ্দ কমিয়ে দিল কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। টাকার অঙ্কে কমল ৬০৮৮ কোটি টাকা, যার মধ্যে স্কুলশিক্ষায় ৪৯৭১ কোটি ও উচ্চশিক্ষায় ১১১৫ কোটি টাকা কমানো হয়েছে।

শিক্ষার উপর এই বাজেট গভীর আঘাত করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে তারা স্বপ্ন দেখিয়েছিল, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়বে, সরকার শিক্ষার জন্য জিডিপি-র ৬ শতাংশ খরচ করবে। তার পরিবর্তে এই বাজেটে শুধু বরাদ্দ কমানো হয়েছে তাই নয়, জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার খোলনলচে পাল্টে নতুন করে সাজানোর নামে তাকে সম্পূর্ণভাবে পুঁজিমালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার সুচতুর পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটানো হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের গালভরা কথা বলেও আর্থিক দায়িত্বের কথা উঠতেই সরকার নিজের দায়িত্ব ছেড়ে বেসরকারি মালিক ও ‘স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের’ ধুয়ো তুলেছে।

*ছয়ের পাতায় দেখুন*

## পুলিশি অত্যাচারে যুবকের মৃত্যুতে শোক

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৫ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, গত ১১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-যুব সংগঠনগুলির উদ্যোগে নবান্ন অভিযানের কর্মসূচিতে নির্মম পুলিশি আক্রমণের ফলে আহত যুবকর্মী মইদুল ইসলাম মিদ্যার মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এমন পুলিশি আক্রমণের আমরা তীব্র নিন্দা করছি এবং তদন্ত সাপেক্ষে দোষী পুলিশের শাস্তি দাবি করছি।

# শিল্পায়নের ভাঁওতা

*একের পাতার পর*

বিজেপি হওয়া নেতারা পর্যন্ত বলে চলেছেন, সিঙ্গুরে টাটাকে তাঁরা ফিরিয়ে আনবেন, নন্দীগ্রামে আবার কেমিক্যাল হাব করবেন তাঁরা। টাটা-ন্যানো গাড়ি কারখানার জন্য তাঁদের মহা হাহুতাশ! যদিও বাস্তব হল, সিঙ্গুর থেকে গুজরাটের সানন্দতে মোদিজির ডেকে নিয়ে যাওয়া সেই ন্যানো গাড়ির কারখানাতে এক বছরের বেশি উৎপাদন বন্ধ। ন্যানো গাড়ি উৎপাদন হোক আর না হোক, সানন্দকে ঘিরে সাতটি গ্রামের বাসিন্দাদের উচ্ছেদের কাজে কোনও ঢিলে দেয়নি বিজেপির রাজ্য সরকার। ওই এলাকার বিজেপি নেতারা জমির-ফ্ল্যাটের দালালি করে কোটিপতি হয়েছেন, দলের অফিসটি সাততলা হয়েছে। বিপরীতে ন্যানো কারখানায় এলাকার মানুষের কাজ তো জোটেইনি, নদীর জল ব্যবহারেও চেপেছে নিষেধাজ্ঞা। এমন শিল্পায়নের খোয়াব দেখিয়েই বিনামূল্যে জমি, জল, বিদ্যুৎ, দেশের মানুষের কষ্টের টাকা টাটাদের উপহার দিয়েছে বিজেপি সরকার। সিঙ্গুরে, নন্দীগ্রামে তেমন 'উন্নয়নের' নামে জমি লুঠের কারবারকে বুকের রক্ত ঢেলে রুখে দিয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। তাই সারা ভারতের জমি রক্ষার আন্দোলনের আদর্শ হয়ে রয়েছে— সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম। ওড়িশার জগৎসিংপুরের পসকো বিরোধী আন্দোলনে জমি রক্ষা করতে গিয়ে কৃষকরা স্মরণ করেছেন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের নাম। কর্নাটকের উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনেও উচ্চারিত হয়েছে এই দুটি সংগ্রামের প্রতীকের কথা। উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় কার রেসিংয়ের জন্য চাষির জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্তি জুগিয়েছে এই নাম। আজ দিল্লির সীমান্ত ঘিরে বসে থাকা কৃষক আন্দোলন খোঁজে সেই একই নাম। কর্পোরেট মালিকদের উন্নয়নের ফর্মুলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে সারা ভারতে শুধু নয় বিশ্বের নানা প্রান্তেও কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষ স্মরণ করেন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের শিক্ষাকে।

আজ একদিকে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে শিল্প না হওয়ার দায় চাপাচ্ছে প্রতিবাদী কৃষকদের উপর। অন্যদিকে সিপিএম নেতারাও ছাত্র-যুবদের নিয়ে কখনও সিঙ্গুরে কখনও বা শালবনিতে গিয়ে 'স্বপ্নের শিলান্যাস' করে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন— তাঁরা সরকারে এলেই শিল্পায়নের বান ডাকবে বাংলায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের চাষি-মজুর-মধ্যবিত্ত-খেটেখাওয়া মানুষের কাছে জমি রক্ষাটা ছিল বাঁচা-মরার প্রশ্ন। তাঁরা তাই বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন, মা-বোনেরা শাসক দলের ভাড়াটে গুণ্ডা বাহিনীর দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছেন, জীবন দিয়েছেন তবু জমি ছাড়েননি। আর রাজ্যের বর্তমান শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীদের কাছে তা ছিল তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভকে ভোট বাক্সে বন্ধ করে আখের গোছানোর প্রশ্ন। কিন্তু তাঁরা জানতেন ভোটের আগে এই আন্দোলন থেকে পালাতে গেলেই তাদের মুখোশটা খুলে যাবে। যতদিন সিঙ্গুর নন্দীগ্রামকে দেখিয়ে ভোট কুড়ানোর সুবিধা পেয়েছেন, তাঁরা তার নাম নিয়েছেন। সরকারের গদিটা পেয়েই একচেটিয়া কর্পোরেট পুঁজির প্রভুদের খুশি করতে যে কোনও আন্দোলনের বিরুদ্ধেই তৃণমূল কংগ্রেস আজ খড়্গহস্ত। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লড়াই এখন তাঁদের চক্ষুশূল। তাই তাঁরা চান সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থাকুক দু'টাকা কেজি চালের উমেদার হয়ে। অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াইতে যেন আর না নামে তারা।

বিধানসভা ভোটের মুখে শিল্প করব, বেকারদের কাজ দেব বলে চলেছে সব ভোটবাজ দল। কেন আমরা বলছি এসব ভাঁওতা? এটা বুঝতে দেখা যাক ভারতে এই মুহূর্তে শিল্পের হালটা কেমন? গত নভেম্বরে শিল্পোৎপাদনের হার ছিল শূন্যের ১.৯ শতাংশ নিচে। হার ঋণাত্মক, অর্থাৎ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি দূরে থাক তা ক্রমাগত কমেছে। নতুন শিল্প খোলা দূরে থাক, তা একের পর এক বন্ধ হয়েছে। এই সংকট কি কোভিড সংক্রমণের জন্য? তথ্য বলছে, না। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে শিল্পবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ০.৪ শতাংশ। তার থেকে সামান্য বেড়ে ২০২১-এর জানুয়ারিতে তা দাঁড়িয়েছে মাত্র ১ শতাংশ। বৃদ্ধিটা কেমন? ২০২০-র এপ্রিলে বৃদ্ধির হার ছিল শূন্যের ৫৭.৩ শতাংশ নিচে (-৫৭.৩ শতাংশ) (সিইআইসিডাটা.কম)। সামান্য উৎপাদন শুরু হয়ে খাতা কলমে শূন্যের ১ শতাংশ উপরে ওঠায় সরকার ঢাক পেটাচ্ছে শিল্প এগোচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে মানুষ দেখছে দেশ জুড়ে হাজার হাজার কলকারখানার ঝাঁপ বন্ধ। যেটুকু চলছে সেখানেও অর্ধেক শ্রমিক, অর্ধেক বেতন নিয়ে কোনওক্রমে চলছে উৎপাদনের চাকা।

২০১৯ সালের ১ জুলাই কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় জানিয়েছিল তিন বছরে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার কারখানা বন্ধ হয়েছে। মোট কারখানার সংখ্যার দিক থেকে যা ৩৬.০৭ শতাংশ। এই বন্ধ কারখানার দেড় লক্ষই মহারাষ্ট্রের।(ইকনমিক টাইমস, ২ জুলাই ২০১৯) গুজরাটে শুধু ২০১৯ সালের প্রথম অংশে বন্ধ হয়েছে ২ হাজারের বেশি কারখানা। ২০১৪ থেকে গুজরাটে রেজিস্টার্ড কারখানার মধ্যে ৩০ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প লালবাতি জ্বেলেছে বলে সরকার স্বীকার করেছিল। যদিও তারাই বলেছে, এই রাজ্যের ৯৫ শতাংশ ক্ষুদ্র শিল্পই রেজিস্টার্ড নয়। ফলে তার খোলা বন্ধ নিয়ে সরকার তথ্য দেয় না। (ডিএনএ নিউজ, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এবং বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, আমেদাবাদ ২৭ মার্চ২০১৪) সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে আন্দোলনের জন্য বাংলায় শিল্প হচ্ছে না, এই মিথ্যা প্রচারটাকেও যদি সত্যি বলে ধরে নেওয়া যায়— তাহলে, গুজারাটে তো বিজেপি সরকার কোনও আন্দোলনই করতে দেয় না। সেখানে শিল্পের এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি কেন?

**● তিন বছরে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার কারখানা বন্ধ হয়েছে। মোট কারখানার সংখ্যার দিক থেকে যা ৩৬.০৭ শতাংশ।**

**● গুজরাটে শুধু ২০১৯ সালের প্রথম অংশে বন্ধ হয়েছে ২ হাজারের বেশি কারখানা। ২০১৪ থেকে গুজরাটে রেজিস্টার্ড কারখানার মধ্যে ৩০ হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প লালবাতি জ্বেলেছে বলে সরকার স্বীকার করেছিল।**

**● অর্থনীতির গবেষকরা দেখাচ্ছেন, বাম্পার উৎপাদন হলেও একই সময়ে গ্রামাঞ্চলে ভোগপণ্য বিক্রি সংকুচিত হয়েছে ৬৬ শতাংশ।**

শিল্প বন্ধ হয় কেন? বাজার নেই বলে। বাজার নেই কেন? মানুষের কেনার ক্ষমতা নেই বলে। এ সত্য অস্বীকার করবে কে? তাই বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা আইএমএফকে পর্যন্ত বলতে হয়েছে, ভারতের বাজারের প্রধান সমস্যা হল তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা তৈরি না হওয়া। কেন? উত্তরটা সবার জানা, রিক্ত-নিঃস্ব জনগণ দুটো ভাত জোগাড় করতেই নাজেহাল, শিল্পপণ্য কিনবে কী করে? দেশের সাধারণ মানুষের কেনার ক্ষমতা আজ কতটুকু তা সরকারের সমীক্ষাই দেখিয়েছে বারবার। গ্রামাঞ্চলে গত রবি এবং খরিফ মরসুমে বাম্পার উৎপাদনের কারণে কৃষি ক্ষেত্রে জিডিপি বেড়েছে প্রায় ৬ শতাংশ। অর্থনীতির গবেষকরা দেখাচ্ছেন, বাম্পার উৎপাদন হলেও একই সময়ে গ্রামাঞ্চলে ভোগপণ্য বিক্রি সংকুচিত হয়েছে ৬৬ শতাংশ। কৃষক পরিবারে ডাল-রাজমা, দুধ, মাছ, ফল ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহার কমেছে ২০ শতাংশের বেশি (ডাউন টু আর্থ, ৩ এবং ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০) । এইসব কৃষক পরিবার যারা দেশের অধিকাংশ, তারা কোন ভোগ্যপণ্যটি কিনতে পারবে?

এই সত্যকে ঢাকা দিতে শিল্পায়নের স্লোগান তুলে বিজেপি সরকার কর্পোরেট মালিকদের হাতে কোটি কোটি টাকার প্যাকেজ তুলে দিচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষকে কার্যত লুঠের ব্যবস্থা করছে। যে কাজ একসময় করেছে কংগ্রেস। রাজ্যের ক্ষমতায় থাকার সময় একই কাজ করতে চেয়েছে সিপিএম। তৃণমূল কংগ্রেসও প্রবল শিল্পদরদ দেখায়। কিন্তু তাদের নীতিও কোনও বুর্জোয়া সরকারের থেকে আলাদা কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গে সত্যিই শিল্প চাইলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাজ্যের পাট শিল্পের অনুকূল নীতি নিত। আম্বানি-আদানিদের মতো পেট্রোকেমিক্যাল লবির প্লাস্টিক ব্যববসার স্বার্থে পাট শিল্পকে দুর্বল করত না। রাষ্ট্রায়ত্ত জেসপ, ব্রেথওয়েট, এম এ এম সি, অপথ্যালমিক গ্লাস কারখানা ইত্যাদিকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিত। চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা, বার্নপুরের ইসকো, দুর্গাপুর স্টিল, ডিপিএল, হিন্দুস্তান কেবলসের মতো সংস্থাকে দুর্বল করার চেষ্টা করত না। বন্ধ ডানলপ, হিন্দুস্তান মোটরস ইত্যাদি খোলবার চেষ্টায় সাহায্য করত। খনিগুলিকে বেসরকারি হাতে তুলে দিয়ে ক্রমাগত রুগ্ন করত না।

বিজেপি যতই ইঞ্জিন জুড়ুক, সিপিএম যতই শিলা পোঁতার নাটক করুক, কংগ্রেস তৃণমূল যতই স্লোগানে গলা ফাটাক। তীব্র মন্দা কবলিত পুঁজিবাদী অর্থনীতিই শিল্পায়নের সামনে প্রধান বাধা। একটা দুটো শিল্প এখানে ওখানে হতে পারে, কিন্তু তাকে শিল্পায়ন বলে না। এর মধ্যেও যতটুকু শিল্প হচ্ছে তাকে পুরোপুরি পুঁজি নির্ভর করায় বাধা দিয়ে কিছু অন্তত কর্মসংস্থানের সুযোগ আদায় করতে হলে চাই তীব্র গণআন্দোলন। রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা বেচে দেওয়ার বিরুদ্ধেও চাই আন্দোলন। এ জন্য ভোটে সরকারের রঙ বদলের থেকেও জরুরি প্রয়োজন আন্দোলনের জোরে দাবি আদায়। ভোটের চমকে তা ভুললে চলবে না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ভাবতে হবে ধোঁকাবাজির স্লোগানে ভুলে গৌরবময় সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করতে দেবেন? তার মধ্য দিয়ে সমস্ত আন্দোলনের উপর সরকারের দমন পীড়নকে বৈধতা দেওয়ার রাস্তা করে দেবেন, নাকি আন্দোলনের শক্তির পাশে দাঁড়াবেন?

## জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাইশহাটা-১ নং লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড বাবুরালী সরদার ২৪ জানুয়ারি এসইউসিআই(সি) অফিসে বিকালে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ছাত্রাবস্থায় ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি এআইকেকেএমএসের জয়নগর ব্লক ২-এর সভাপতি ছিলেন। তিনি পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন এবং এই দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করেছেন। এলাকার সাংগঠনিক দায়িত্ব দীর্ঘদিন পালন করার সাথে পঞ্চায়েত সমিতির সরকারি পদে থেকেও কপর্দকশূন্য অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সততা ও নিষ্ঠার কথা এলাকার মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়। তিনি খুবই সরল সাদাসিধে জীবন-যাপন করতেন। পার্টি যে কোনও কাজ দিক না কেন তিনি হাসিমুখে সেই কর্মসূচি রূপায়ণ করতেন।

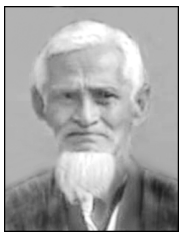

**কমরেড বাবুরালী সরদার লাল সেলাম**

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাইশহাটা ৩ নং লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড সুভাষ হালদার ৩০ নভেম্বর ২০২০ দীর্ঘ রোগভোগের পর নিজ বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ১৯৬০-এর দশকে পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কৃষকের বেনামি জমি উদ্ধারের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন ও তাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়ে দীর্ঘদিন সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। এলাকাতেও দলমত নির্বিশেষে সবার আপনজন ছিলেনট।

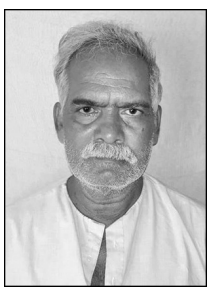

**কমরেড সুভাষ হালদার লাল সেলাম**

## স্মরণসভা

কমরেড বাবুরালী সরদার ও কমরেড সুভাষ হালদার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ৬ ফেব্রুয়ারি বাইশহাটার কিল্লাদুর্গানগর মোড়ে। সভাপতিত্ব করেন আব্দুল ওহাব হালদার। প্রধান বক্তা ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তরুণকান্তি নস্কর এবং কুলতলী বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার। বক্তাগণ প্রয়াত কমরেডদের জীবনসংগ্রাম ও বিভিন্ন গণআন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা তুলে ধরেন। তাঁরা প্রয়াত দুই কর্মীর জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষণীয় দিকগুলি গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

# ভীমা-কোরেগাঁও মামলার পিছনে কি ষড়যন্ত্র?

সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেই ‘দেশদ্রোহী’ বলে অভিযুক্ত করে দেওয়া বিজেপি সরকারের দস্তুর হয়ে উঠেছে। সেই সরকার নিজেই আজ দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানোর ভয়ঙ্কর অভিযোগের মুখে। ভীমা-কোরেগাঁও মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত সমাজকর্মী রোনা উইলসনকে যে সব ‘তথ্যপ্রমাণ’-এর ভিত্তিতে জেলে ভরেছে মহারাষ্ট্রের পূর্বতন বিজেপি সরকারের পুলিশ, সেগুলি বাইরে থেকে ম্যালওয়ারের মাধ্যমে তাঁর ল্যাপটপে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছে প্রথম সারির মার্কিন সংবাদপত্র ‘দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট’। ফলে এই মামলায় জামিন-অযোগ্য ধারায় দিনের পর দিন বন্দি রাখা হয়েছে যে সমস্ত সমাজকর্মীদের, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের পুরোটাই বিজেপি সরকারের সাজানো ষড়যন্ত্র কি না— এ নিয়ে মারাত্মক প্রশ্ন উঠে গেছে।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, রোনা উইলসনের আইনজীবীর অনুরোধে আমেরিকার ‘আর্সেনাল কনসালটিং’ নামে একটি ডিজিটাল ফরেনসিক সংস্থা তাঁর ল্যাপটপে পাওয়া নথি পরীক্ষা করে। সংস্থাটি জানায়, রোনার ল্যাপটপে অন্তত দশটি ভুয়ো চিঠি ম্যালওয়ারের মাধ্যমে ঢোকানো হয়েছিল এবং ঘটনা হল, সেই চিঠিগুলিকেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরে তার ভিত্তিতে চার্জশিট দিয়েছিল বিজেপি সরকারের পুলিশ।

বছর দুয়েক আগে গোটা দেশে আলোড়ন তুলেছিল ভীমা-কোরেগাঁও মামলা। ২০১৮-র ১ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের ভীমা-কোরেগাঁওয়ের দলিত সমাবেশকে কেন্দ্র করে হাঙ্গামায় মৃত্যু হয় এক জনের, আহত হন বেশ কয়েকজন। ঠিক তার আগের দিন ‘এলগার পরিষদ’-এর সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন এমন কয়েকজন, যাঁরা দলিত ও জনজাতিভুক্ত মানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে পরিচিত মুখ। এঁদের ‘উত্তেজক’ ভাষণই এই হিংসার জন্য দায়ী এই অভিযোগ তুলে ২০১৮-র জুনে গ্রেপ্তার করা হয় রোনা সহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিক, অধ্যাপক ও সমাজকর্মীকে। ওই বছরের নভেম্বরে ৫ হাজার পাতার চার্জশিট পেশ করে পুণে পুলিশ। অভিযোগ করে, এঁরা প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা সহ রাষ্ট্রবিরোধী নানা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। পরে ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে পুণে পুলিশ চার্জশিটের একটি সংযোজনী তৈরি করে। সেখানে প্রবীণ বামপন্থী কবি, অসুস্থ ভারভারা রাও সহ বেশ কয়েকজন সমাজকর্মীর নাম এই মামলায় যুক্ত করে তারা। পরে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করে ৮২ বছরের মিশনারি স্ট্যান স্বামীকে। ২০২০ সালে মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পরাজিত হলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ভীমা-কোরেগাঁও মামলার ভার তুলে দেয় এনআইএ-র হাতে।

মার্কিন ফরেনসিক সংস্থাটির তদন্তে প্রকাশ, এই মামলারই অন্যতম অভিযুক্ত ভারভারা রাওয়ের ই-মেল অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে সেখান থেকে একের পর এক ই-মেল পাঠানো হয় উইলসনের কাছে। অনুরোধ আসতে থাকে সেগুলো খুলে দেখার। উইলসন একটি ই-মেলের লিঙ্ক খুলতেই ম্যালওয়ার ঢুকে পড়ে তাঁর ল্যাপটপে এবং তার মাধ্যমে হ্যাকাররা অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে তাঁর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টগুলি। এই পথেই উইলসনের ল্যাপটপে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এমন সব জাল চিঠিপত্র যেখানে রাষ্ট্রবিরোধী ও সরকার ফেলে দেওয়ার চক্রান্তের অংশীদার হিসাবে দেখানো রয়েছে উইলসনকে।

আর্সেনাল কনসালটিং-এর ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্ট যদি সত্য হয়, তা হলে তো এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায়ই থাকে না যে, বিজেপি সরকারের শাসনে দেশের মানুষ আজ চরম বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে। এমনিতেই বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে সরকারি দল ও নেতা-মন্ত্রীদের ফ্যাসিস্টসুলভ কার্যকলাপ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন বিঘ্নিত করছে। যে খোলামেলা উদারনৈতিক পরিবেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, দিনে দিনে তা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। কে কী খাবে, কী পোশাক পরবে, কোন ধর্মের মানুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে যাবে— সমস্ত বিষয়ে বিজেপি সরকারের নেতা-কর্মীরা নিদান জারি করছেন। সরকারের অপকীর্তির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেই ‘দেশবিরোধী’ তকমা লাগিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে সরকারি ভাবে। ঘটছে শারীরিক নির্যাতন, খুন, মিথ্যে মামলায় জেলে ভরার মতো ঘটনা। এর ওপর যদি আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ষড়যন্ত্রের জাল এভাবে পোক্ত করা হয়, তা হলে নাগরিকদের ন্যূনতম সুরক্ষা বলে তো কিছু থাকে না! ইতিমধ্যেই জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ সমাজমাধ্যমের পোস্টগুলির ওপর নজরদারি চালাতে কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরকারের ভয়ঙ্কর হস্তক্ষেপ বলে সরব হয়েছেন দেশের সচেতন মহল। পাঁচ বছর অন্তর সাধারণ মানুষের কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে সরকার নির্বাচন করে। মানুষ নিজের জীবন ও সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে সরকারের ওপর। সেই ‘রক্ষক’ সরকারই যদি এভাবে ‘ভক্ষক’-এর রূপ ধরে, তা হলে দেশটাকে কি আর ‘গণতান্ত্রিক’ বলা যায়?

বিজেপি সরকারকে হয় অবিলম্বে জবাব দিতে হবে এ ধরনের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে সামিল হওয়ার অধিকার তাদের কে দিয়েছে। নয়তো তাদের প্রমাণ করতে হবে, আর্সেনাল কনসালটিং-এর তদন্ত রিপোর্ট সঠিক নয়। অবিলম্বে এ বিষয়ে দেশের মানুষের সমস্ত সন্দেহ যদি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নিরসন করতে না পারে, তা হলে সরকারি ক্ষমতায় বসে থাকার অধিকার তাদের দিতে পারে না দেশের মানুষ।

# ধোঁয়াশা ভরা চমকে ঠাসা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বাজেট

করোনা অতিমারি পরিস্থিতি দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বেহাল দশা মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। জনসাধারণ আশা করেছিল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ভগ্ন দশা মেরামত করতে এবারের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ খানিকটা অন্তত বাড়বে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, গত বছরের তুলনায় ১৩৭ শতাংশ বাড়িয়ে ২০২১-’২২ অর্থবর্ষের স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ করা হল ২২ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৬ কোটি টাকা। এই বৃদ্ধি অবশ্যই মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। কারণ করোনা অতিমারি পরিস্থিতিকে কোনও রকমে সামলাতে হলেও অর্থ বরাদ্দ এই রকমই বা এর চেয়েও বেশি পরিমাণে বাড়ানো দরকার। বাজেট দেখে দেশের বড় বড় শিল্পপতিরাও প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

কিন্তু বাজেটের নথিপত্র হাতে আসার পর দেখা গেল, অর্থমন্ত্রীর ঘোষণার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। বরং বলা ভাল, তা হিসাবের কারচুপিতে ভর্তি। আমরা যদি বিগত বছরগুলির স্বাস্থ্য বাজেটের দিকে তাকাই, দেখা যাবে ঃ

| বছর | কোটি টাকা |
|---|---|
| ২০১৯-’২০ | ৬৬,০৪১.৯৫ |
| ২০২০-’২১ | ৬৯,২৩৩.৮৮ |
| ২০২০-’২১(সংশোধিত) | ৮৫,২৫০.৩৮ |
| ২০২১-’২২ | ৭৬,৯০২.০৭ |

প্রকৃত অর্থে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বাজেটে গত বছরের তুলনায় ৮,৩৪৮ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। তা হলে ২২,৩,৮৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রশ্ন উঠছে কোত্থেকে? এ কি অর্থমন্ত্রী ভুল করে বলে ফেলেছেন? না। সজ্ঞানে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই তিনি এই ঘোষণা করেছেন। আসলে এই টাকার মধ্যে আরও কতকগুলি খাতের টাকা ঢুকিয়ে, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে। যেমন, জল ও নিকাশী ব্যবস্থার জন্য প্রতি বছরই আলাদা করে বরাদ্দ ধরা হয়। এ বছরও তার পরিমাণ হল ৬০,০৩০ কোটি টাকা, এছাড়া পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের হিসাব অনুযায়ী স্বাস্থ্য, নিকাশী ব্যবস্থা ইত্যাদি বাবদ রাজ্যকে দেয় ৪৯,০০০ কোটি টাকা। এ রকমই বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ অর্থ যা নিয়মমাফিক প্রতি বছর আলাদা আলাদা করে বরাদ্দ করা হয়, সুচতুরভাবে তার সবগুলোকে একত্রিত করে স্বাস্থ্য বাজেট হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এবার স্বাস্থ্য খাতে প্রকৃত বরাদ্দ কিন্তু মাত্র ৭১,২৬৯ কোটি টাকা, যা গত বছরের চেয়ে অনেক কম।

এই ছলচাতুরির কি কোনও প্রয়োজন ছিল? মানুষকে কি তারা এতটাই বোকা ভাবেন যে, এসব তারা ধরতে পারবে না! পাশাপাশি মোদি সরকার আত্মনির্ভর স্বাস্থ্য ভারত যোজনা নামক একটি প্রকল্প ঘোষণা করেছে, যেখানে ৬৪,১৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই টাকা আগামী ৬ বছর ধরে খরচ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বছরে ১০,৬৯৬ কোটি টাকা খরচ হবে। বাজেটে চমক দেওয়ার ঝোঁকে এই সম্পূর্ণ ৬৪,১৮০ কোটি টাকাই এবারের বাজেটে ঘোষণা হয়েছে। এই বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করা হবে প্রধানত গ্রামের ১৭,৭৮৮টি এবং শহরের ১১,০২৪টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো এবং জনস্বাস্থ্যের কিছু ল্যাবরেটরি তৈরি করার জন্য। এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি কী? আসলে এগুলি থেকে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতোই পরিষেবা পাওয়া যাবে। কোনও ডাক্তার থাকবেন না সেখানে। করোনা পরিস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ইতিমধ্যেই বিজেপি সরকার চিকিৎসকদের গণতান্ত্রিক বডি এমসিআই-কে ভেঙে দিয়ে তৈরি করেছে স্বৈরতান্ত্রিক বডি ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন। যার সুপারিশ অনুযায়ী মধ্যবর্তী স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা দাতাদের মাত্র ৬ মাসের ট্রেনিং দিয়ে এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে কার্যত ডাক্তারের কাজ করানো হবে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভবিষ্যতে ডাক্তারির লাইসেন্সও দেওয়া হতে পারে। জনগণের পকেটের টাকা স্বাস্থ্যের অত্যাবশ্যকীয় ঘাটতি পূরণের কাজে না লাগিয়ে এভাবে চটকদার নতুন প্রকল্প চালু করে মানুষের মন ভোলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

মূল স্বাস্থ্য বাজেটে করোনা টিকাকরণের জন্য ৩,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যে টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় কোনও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরি করা হবে না, যা মূলত ভ্যাক্সিন কোম্পানিগুলির বাজেটেই যাবে। তাই তো ভ্যাক্সিন কোম্পানিগুলির মুনাফা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার তড়িঘড়ি ট্রায়াল শেষ হওয়ার আগেই, মানুষের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও— টিকাকরণের কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু করে দিয়েছে। যদিও টিকাকরণ দ্বারা হার্ড ইমিউনিটি তৈরি করতে না পারলে প্যানডেমিক নিয়ন্ত্রণে তার বিশেষ কিছু কার্যকরী ভূমিকা থাকে না। এমনই মত ডাক্তারদের। তাছাড়া ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা বলা হচ্ছে যেখানে মাত্র ৬০ শতাংশ এবং তা-ও মাত্র ৬ মাসের জন্য। যেখানে সারা দেশের সব মানুষকেই এক সাথে খুব কম সময়ের মধ্যে টিকাকারণ করতে পারলে তবেই হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হতে পারে। স্বাস্থ্যব্যবস্থার বর্তমান পর্যায়ে যা বাস্তবে অসম্ভব। করোনা মোকাবিলায় যে পরিকাঠামো দরকার, যে ধরণের গবেষণা কেন্দ্র দরকার, যে প্রশিক্ষিত লোকবল দরকার, তার কোনও কিছুই কিন্তু এই বাজেটে বলা হল না। বলা হল না স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর বিরাট ঘাটতি মেটানোর কোনও রকম পরিকল্পনাও। যে স্তরের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দিয়ে কিউবা, ভিয়েতনামের মতো দেশ করোনা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়েছে, সেরকম পরিকাঠামো, পরিকল্পনা, ইত্যাদির ছোঁয়াও বাজেটে দেখতে পাওয়া গেল না। বাজেটে রইল শুধু ধোঁয়াশা ভরা চমক।

# পুলিশি আক্রমণে মৃত্যুতে শোক ডিএসও-ডিওয়াইও-র

এআইডিএসও এবং এআইডিওয়াইও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ১৫ ফেব্রুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেছে, ১১ ফেব্রুয়ারি, ১০টি বাম ছাত্র-যুব সংগঠনের নবান্ন অভিযানে রাজ্য সরকারের পুলিশ প্রশাসনের আন্দোলনবিরোধী অগণতান্ত্রিক ভূমিকা ও লাঠি-জলকামান-টিয়ার গ্যাস দিয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণের ফলশ্রুতিতে আজ যুবকর্মী মইদুল ইসলাম মিদ্যার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আমরা আগেই রাজ্য সরকারের এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেছি। আমরা এই মৃত্যুর উপযুক্ত তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। একই সাথে আমরা মনে করি, দেশের এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে ক্ষমতা দখলের নির্বাচনসর্বস্ব রাজনীতির বিপরীতে, শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী বামপন্থী ছাত্র-যুব আন্দোলন সময়ের আহ্বান। আমরা রাজ্যের ছাত্র যুব সমাজের কাছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সকল জনবিরোধী নীতি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার ঐকান্তিক আহ্বান জানাচ্ছি।

# ১০০ দিনের কাজে বরাদ্দ ছাঁটাই ৪২ হাজার কোটি টাকা

কেমন শাসন দিতে পারে বিজেপি সরকার দেখিয়ে দিল কেন্দ্রীয় বাজেট। বাজেটটি পুঁজিপতি শ্রেণির জন্য উদারহস্ত, কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের উপর নির্মম। শ্রমজীবীদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত যে অংশ তাদেরই উপর অর্থনৈতিক আঘাত সবচেয়ে বেশি হানা হয়েছে। এমনিতেই গ্রামীণ কৃষি শ্রমিকদের চাষের কয়েক মাস ছাড়া সারা বছর নিশ্চিত কাজ নেই। বহু আন্দোলনের পর কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। তখনই প্রশ্ন উঠেছিল, মাত্র ১০০ দিন কেন? বাকি সময়টাতে খেতমজুরেরা কোথায় কাজ করবে? বছরে অন্তত ২০০ দিন কাজ দিতে হবে। দাবি উঠেছিল, ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সমতা বজায় রেখে মজুরি বাড়াতে হবে। কিন্তু এই দাবিগুলির কোনওটাই মান্যতা পেল না কেন্দ্রীয় বাজেটে।

তা হলে গ্রামীণ মজুরদের কী দিল কেন্দ্রীয় বাজেট? বাজেটে ১০০ দিনের কর্মসংস্থান বরাদ্দ প্রকল্প ৩৭ শতাংশ ছাঁটাই করা হল। গত বছরের বরাদ্দ ১ লাখ ১৫ হাজার কোটি থেকে ৪২ হাজার কোটি টাকা কমিয়ে এবার করা হয়েছে মাত্র ৭৩ হাজার কোটি টাকা। ফলে গ্রামীণ কৃষি মজুরদের কাজের সুযোগ আরও কমে গেল। অথচ প্রয়োজন ছিল এই প্রকল্পে বরাদ্দ আরও বাড়ানোর। প্রয়োজন ছিল লকডাউনের জেরে কাজ হারিয়ে গ্রামে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা বিবেচনা করে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ বরাদ্দ করা। তা না করে বরাদ্দ বিপুল পরিমাণে ছাঁটাই করা হল।

লকডাউনের আগে থেকেই ভারতীয় অর্থনীতি পুঁজিবাদের অনিবার্য নিয়মে মন্দা কবলিত। এই মন্দা থেকে অর্থনীতিকে বাঁচানোর নামে কেন্দ্রীয় সরকার দফায় দফায় হাজার হাজার কোটি টাকার ত্রাণ প্যাকেজ পুঁজিপতিদের দিলেও মন্দা কাটার কোনও লক্ষণই নেই। সরকারি ত্রাণ প্যাকেজ পেয়ে ভারতের প্রথম সারির ১০০ জন পুঁজিপতির গড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকার সম্পদ বাড়লেও মন্দা তাতে কাটেনি। মন্দা কাটাতে জরুরি প্রয়োজন জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি। সেটা সাময়িকভাবে হলেও কিছুটা বাড়ত যদি সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণ প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানো হত। অথচ সরকার বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটল। বরাদ্দ কমানো হল পিএম কিসান প্রকল্পেও। এই প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ৭৫ হাজার কোটি টাকা। এবার সেখানে ১০ হাজার টাকা কম বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থাৎ কৃষি এবং কৃষি মজুর উভয়ের স্বার্থেই আঘাত হেনেছে মোদি সরকারের আর্থিক বাজেট।

এই বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে প্রচার করছে ক্ষমতায় এলে তারা সোনার বাংলা গড়বে। কিন্তু সেই সোনার বাংলায় গরিবের ঠাঁই হবে তো?

# বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী পূর্তি অনুষ্ঠান ত্রিপুরায়

১৪ ফেব্রুয়ারি আগরতলার প্রেস ক্লাবে বিদ্যাসাগর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী উদযাপন কমিটির উদ্যোগে বর্ষ ব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন কমিটির সম্পাদক ডঃ অলোক শতপথী। বিদ্যাসাগরের জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেন সুভাষকান্তি দাস ও তপন লোধ। বক্তারা বাংলা ভাষার বিকাশ, আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষার প্রচলন, বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ করা ও বাল্য বিবাহ রদ করা সহ সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ ভূমিকা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভানেত্রী পূর্ণিমা রায় ও সঞ্চালনা করেন প্রণব নন্দী।

# এআইএমএসএস-এর কলকাতা জেলা সম্মেলন

নারী নির্যাতন-ধর্ষণ, নারী-শিশু পাচার ও মদ-মাদকের প্রসার রুখতে এবং নয়া কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি ভারতসভা হলে অনুষ্ঠিত হল অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সপ্তম কলকাতা জেলা

সম্মেলন। সম্মেলন থেকে ৩৭ জনের জেলা কমিটি সহ মোট ৮১ জনের কমিটি তৈরি হয়েছে। নবনির্বাচিত কমিটির সভানেত্রী ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে অপর্ণা মণ্ডল ও অনন্যা নাইয়া। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী সুজাতা ব্যানার্জী এবং এস ইউ সি আই (সি)-র কলকাতা জেলা সম্পাদক সুব্রত গৌড়ী।

উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কল্পনা দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সমাজের বুকে ঘটে চলা সমস্ত অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে নারীসমাজের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিপূরক গণআন্দোলন আগামী দিনে গড়ে তোলা এবং সেই উদ্দেশ্যে এলাকায় এলাকায় মহিলাদের সংগঠিত করার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

# রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি চিটফান্ড ক্ষতিগ্রস্তদের

চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচ হাজার মানুষ ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ'য়ে সমবেত হয়ে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেন। জানুয়ারি মাস থেকে থানা, মহকুমা, জেলা পর্যায়ে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের পর কলকাতায় এই কর্মসূচি হয়। সমাবেশে আশরাফুল হক, নবকুমার পাল, ইব্রাহিম বিশ্বাস, নির্মল সরকার, নাজমা গায়েন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের সভপতি রূপম চৌধুরী বলেন, চিটফান্ড কাণ্ডে মানুষ দু'ভাবে প্রতারিত হয়েছেন। এই চিটফান্ডগুলি সরকার অনুমোদিত ছিল। এদের টাকা তোলার যথেচ্ছ অনুমতি শুধু নয়, সরকারগুলি সব রকমভাবে মদত দিয়েছে। আর একটা প্রতারণা হল কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময়ে দেশের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মোদি সরকার পুনরায় ক্ষমতায় এলে ১২০ দিনের মধ্যে চিটফান্ড সমস্যা সমাধান করবেন। এক বছর আট মাস হতে চলল সরকারের কোনও হেলদোল নেই।

অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন দীর্ঘ আন্দোলন করে এজেন্টদের নিরাপত্তা ও সরকারকে কমিটি গঠন করতে বাধ্য করেছে। কমিটি কিছু কিছু টাকা ফেরত দিচ্ছে। যে বিপুল পরিমাণ টাকা লুঠ হয়েছে সেই পরিমাণ অর্থ একমাত্র সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভব।

কেন্দ্রীয় সরকার শিল্পপতিদের বিগত ১৫ বছরে নানা ক্ষেত্রে ১৩ লক্ষ কোটি টাকা ছাড় দিয়েছেন। শিল্পপতিরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে ফেরত দেয়নি, সরকার টাকা মকুব করেছে ১২ লক্ষ কোটি টাকা। এই রাজ্য সহ সারা দেশে চিটফান্ড কাণ্ডে টাকা লুটের পরিমাণ ৭ লক্ষ কোটি, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ৩৫ কোটি। সভাপতি বলেন, নির্বাচনে কোনও দল জিতবে, কোনও দল হারবে, কিন্তু তাতে চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সমস্যার সমাধান হবে না। এই সময়েও আমাদের দাবি আদায়ের আন্দোলন চলবে।

*কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের আনা কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে কৃষকদের উপর পুলিশি নিপীড়নের বিরুদ্ধে ১৪ ফেব্রুয়ারি নদিয়ার কৃষ্ণনগর শহরে কৃষক সংহতি মঞ্চের পক্ষ থেকে মশাল মিছিল হয়। উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর কৃষক সংহতি মঞ্চের আহ্বায়ক শেষাদ্রী রায় ও তেহট্ট মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শিবশঙ্কর পাল।*

# সিপিএমের মতো তৃণমূল সরকারও মোটরভ্যান চালকদের দাবি উপেক্ষা করছে

এ রাজ্যে হাজার হাজার গরিব মানুষ মোটরভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু সরকারি লাইসেন্সের অভাবে তাঁরা প্রতিনিয়ত পুলিশি হয়রানির শিকার। সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের লাগাতার আন্দোলনের চাপে পূর্বতন সিপিএম সরকার লাইসেন্স দেওয়ার আশ্বাস দিলেও শেষ পর্যন্ত তা দেয়নি। তৃণমূল সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ২০১৩-তে এক সার্কুলার দিয়ে লাইসেন্স দেওয়ার ঘোষণা করলেও শুধুমাত্র উত্তর দিনাজপুর জেলায় কয়েকশো লাইসেন্স দিয়েই এই কর্মসূচি বন্ধ করে দিয়েছে। এই অবস্থায় সংগঠনের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে ২০১৬ সালে সরকার টেম্পরারি আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (টিন) দেওয়া চালু করলেও এখনও সর্বত্র দেওয়া হয়নি।

সিপিএম সরকারের মতো তৃণমূল সরকারও এঁদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতির দাবি উপেক্ষা করে চলেছে। ফলে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুযোগ থেকেও এরা বঞ্চিত। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে ১১ ফেব্রুয়ারি পাঁচ হাজারেরও বেশি ভ্যানচালক কলকাতায় বিক্ষোভ দেখান এবং শ্রমমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেন। তাঁদের আরও দাবি, দুর্ঘটনাজনিত বিমা চালু, পিএফ, পেনশন এবং করমুক্ত ডিজেল সরবরাহ করতে হবে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তপন মুখার্জী, জয়ন্ত সাহা, অংশুধর মণ্ডল, জগদীশ শাসমল, গৌরহরি মিস্ত্রি, দীনেশ মেইকাপ প্রমুখ। শ্রমমন্ত্রীকে দাবিপত্র পেশ করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অশোক দাস এবং সম্পাদক দীপক চৌধুরী।

# পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের নদীয়া জেলা সম্মেলন

১৩ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগর শহরের কবি বিজয়লাল এইচ এস ইনস্টিটিউটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের নদীয়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দাবি তুলে ধরা হয়, স্যাট-এর রায় মেনে মহার্ঘ ভাতা, পঞ্চায়েত কর্মচারীদের জন্য হেলথ স্কিম চালু, সব অস্থায়ী কর্মচারীকে স্থায়ী করা এবং সব শূন্য পদে নিয়োগ করা হবে ইত্যাদি। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সভাপতি কমরেড সত্যেন মজুমদার, যুগ্ম সম্পাদক কমরেড ইন্দুভূষণ গায়েন এবং জেলা সভাপতি কমরেড গোবিন্দ রায়।

উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক কমরেড সুনির্মল দাস। ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ফসেট-ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে নদীয়া জেলার সদস্য মৃত্যুঞ্জয় মিস্ত্রি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। তফসিলি জাতি-উপজাতি আশ্রম হোস্টেল ও পঞ্চায়েতের ট্যাক্স কালেক্টর সহ স্থায়ী সদস্যদের উপস্থিতিতে আগামী দিনে সরকারি কর্মচারীদের দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে কমরেড গোবিন্দ রায়কে সভাপতি এবং কমরেড দেবাশীষ ব্যানার্জিকে সম্পাদক করে জেলা কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন কমরেড মধুসূদন প্রামাণিক এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিদিপ্তা যাদব।

# বাঁচার মতো বেতনের দাবি 'কর্মবন্ধু'দের

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে অফিস খোলা-বন্ধ, ঝাঁট দেওয়া, জল দেওয়া, অফিসিয়াল লেখালেখির কাজ—সবই করতে হয় ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার বা 'কর্মবন্ধু'দের। বর্তমানে দুয়ারে সরকার কর্মসূচিরও অন্যতম নির্ভরতা তাঁরাই। অথচ তাঁরা বেতন পান মাসিক মাত্র ৩ হাজার টাকা। নেই কোনও নিয়োগপত্র বা পরিচয়পত্র। অবসর নিলে এক পয়সাও সরকার তাঁদের দেয় না।

এই বঞ্চনার অবসানের দাবি তুলেছে হাওড়া জেলা ওয়াটার ক্যারিয়ার সুইপার ইউনিয়ন। ৪ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে ২১ হাজার টাকা মাসিক বেতন, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর স্বীকৃতি, ১৯৯৯ সাল থেকে বকেয়া প্রদান, অবসরকালে ৩ লাখ টাকা এককালীন ভাতা ইত্যাদি দাবি তুলেছেন ইউনিয়নের সদস্যরা।

# 'প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা' বন্ধ করে দিল মোদি সরকার

২০২১ সালে ভারতে গরিবি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে। করোনা অতিমারির কারণে এবং বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার কারণে দারিদ্র ভয়ঙ্কর অবস্থায় পৌঁছচ্ছে। 'ইউনাইটেড নেশন ইউনিভার্সিটি'-র একটি সমীক্ষা বলছে, বিশ্ব ব্যাঙ্ক নির্ধারিত দারিদ্র সীমার সংজ্ঞা (দৈনিক প্রায় দুশো তেতাল্লিশ টাকায় জীবনধারণ) অনুযায়ী ভারতের ষাট শতাংশ (প্রায় ৮১ কোটি ২০ লক্ষ) মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করেন। লকডাউনের পরবর্তী পর্যায়ে তা পৌঁছে গেছে প্রায় ৯২ কোটিতে। এই অবস্থায় কোনও পর্যালোচনা ছাড়াই নভেম্বরে মোদি সরকার প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা বন্ধ করে দিয়েছে। লকডাউনের পরে রুটিরুজি হারানো মানুষের জন্য এই প্রকল্প চালু হলেও প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়ার আগে জনসাধারণের পরিস্থিতি নিয়ে কোনও সমীক্ষা হয়নি। রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে থাকা সংস্থা 'ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম'-এর গবেষণায় জানা গেছে, অতিমারির দরুন ১০ বছরের মধ্যে বিশ্বে ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ চরম দারিদ্রের শিকার হবেন। অর্থাৎ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৮ ভাগের এক ভাগ (সেন্সাস বুরোর ইন্টারন্যাশনাল ডেটা বেস জানাচ্ছে, বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা ৮০০ কোটির মতো) বিপর্যয়ের মুখে পড়বেন।

২ ফেব্রুয়ারি খাদ্যমন্ত্রক সংসদে জানিয়েছে, খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় থাকা মানুষকে সুরাহা দিতে এপ্রিল থেকে মাসে মাথা পিছু বাড়তি পাঁচ কেজি চাল-গম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছিল। এতে দেশের প্রায় ৮০.৪৩ কোটি মানুষ, পশ্চিমবঙ্গের ৬ কোটি মানুষ সুবিধা পেয়েছেন। প্রশ্ন হল দেশ এখনও করোনামুক্ত নয়, অর্থনীতিতে তার ধাক্কাও চলছে। বহু মানুষ কাজ ফিরে পাননি, ছাঁটাই হয়েছেন অনেকে। তা হলে সরকার কিসের ভিত্তিতে ধরে নিল, বিনামূল্যে বাড়তি চাল-গমের আর প্রয়োজন নেই।

গরিব দরদের কথা বলে যে সরকার, তারা গরিব মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় কী করে? এরা আবার 'আত্মনির্ভর ভারতের' গল্প শোনায়!

# অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের পেনশন বৃদ্ধির দাবি

অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের বার্ষিক পেনশন বৃদ্ধি, বাড়ি ভাড়া ভাতা দেওয়া, চিকিৎসাভাতা বৃদ্ধি ও চিকিৎসার সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব সরকার কর্তৃক বহন, অবসরের পরেই পেনশন এবং প্রতি মাসের ১ তারিখে পেনশন সুনিশ্চিত করা, লাইফ সার্টিফিকেট জমা নিয়ে অযথা হয়রানি বন্ধ করা ইত্যাদি দাবি তুলল অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। ১১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ত্রিপুরা হিতসাধনী সভা হলে এক সভায় এই দাবিসহ জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করা এবং কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়।

সভায় সংগঠনের সভাপতি কার্তিক সাহা দাবি আদায়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ১৪টি জেলার প্রতিনিধিদের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন, প্রবীণ শিক্ষক সুনীল কুমার ঘোষ, অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মৃণালকান্তি দাস, সুধীর মাল, দুলাল মণ্ডল, এনামুল হক মোল্লা, বাণী পাত্র, তপতী মিত্র প্রমুখ। সভায় ২৫ ফেব্রুয়ারি পেনশন অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন সহ শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব ও রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

# তমলুকে পরিচারিকা সমিতির ডেপুটেশন

কোভিড পরিস্থিতির মতো বিনামূল্যে রেশন, সাপ্তাহিক ছুটি, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি, মাসিক ৭৫০০ টাকা ভাতা প্রভৃতি দাবিতে ১১ ফেব্রুয়ারি তমলুক মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিল এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি। হাসপাতাল মোড় থেকে শতাধিক পরিচারিকা মিছিল করে মহকুমা শাসকের দপ্তরে যান এবং ডেপুটেশন দেন। নেতৃত্ব দেন সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির নেতা অসীমা পাহাড়ি, অঞ্জলি মান্না, রমা দাস, মালতী জানা প্রমুখ।

## পাঠকের মতামত

# কলেজ স্থাপন জরুরি

স্বাধীনতার ৭৪ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তিনটি ব্লক হেমতাবাদ ও গোয়ালপোখর-১, গোয়ালপোখর-২ শিক্ষা, সড়ক পরিবহণ ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে।

হেমতাবাদ ব্লকে উচ্চমাধ্যমিক ও জুনিয়র মিলিয়ে ১৩টি বিদ্যালয় ও ৪টি হাই মাদ্রাসা রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চবিদ্যালয়ে প্রায় ১৩-১৪ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে এবং হেমতাবাদ থেকে প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী ৩০-৩৫ কিলোমিটার দূরে, কোথাও তারও বেশি দূরের স্কুলে যেতে হয়। রায়গঞ্জ অথবা কালিয়াগঞ্জ কলেজে আসতে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর প্রতিদিন বিপুল খরচ হওয়ায় অনেকেই নিয়মিত ক্লাস করতে পারে না। হেমতাবাদ ব্লক জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাট জরাজীর্ণ হওয়ায় প্রায় দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু রোগী নিয়ে হাসপাতালে সঠিক সময়ে পৌঁছানো যায় না। দূরত্ব অনেকখানি হওয়ায় অভিভাবকরা মেয়েদের রায়গঞ্জে কিংবা কালিয়াগঞ্জে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাতে চান না। ফলে ছাত্রীদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায় এবং উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই এই এলাকায় ছাত্রছাত্রী ও এলাকাবাসীর দাবি মেনে হেমতাবাদে একটি কলেজ স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি।

উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্য দুই ব্লক গোয়ালপোখর-১ ও গোয়ালপোখর-২ ব্লক মিলে ২০টি হাইস্কুল ও কয়েকটি মাদ্রাসা থাকা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার জগত থেকে বিচ্ছিন্ন সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা। মাদ্রাসা ও জুনিয়র হাইস্কুল মিলে প্রায় ৩৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করে কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য ডালখোলা, রায়গঞ্জ অথবা ইসলামপুরের যেতে হয়। দুটি ব্লক থেকে রায়গঞ্জের কলেজের দূরত্ব ৫০ থেকে ৮০ কিলোমিটার এবং এখানে সরাসরি কোনও যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। ডালখোলা কলেজের দূরত্ব ৩০-৪০ কিলোমিটার। এখান থেকেও গোয়ালপোখরে সরাসরি যাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। ইসলামপুরের থেকে গোয়ালপোখরের বিভিন্ন জায়গার দূরত্ব ২৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার। একমাত্র ইসলামপুর থেকে গোয়ালপোখরের সরাসরি সড়ক ব্যবস্থা থাকলেও তা অপ্রতুল।

উত্তর দিনাজপুর জেলার শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে অন্যান্য পরিষেবার মতো রাজ্য সরকারের কাছে দুটি ব্লকের নাগরিকদের দীর্ঘদিনের দাবি— অবিলম্বে হেমতাবাদ ও গোয়ালপোখর ব্লকে কলেজ স্থাপন করে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট উন্নত করে নাগরিকদের যাতায়াতের সুব্যবস্থা করতে হবে।

**শ্যামল দত্ত**
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

# শিক্ষা বাজেট

*একের পাতার পর*

এই বাজেটের পর ‘শিক্ষার অধিকার’ কথাটি আরও বেশি অর্থহীন হয়ে পড়ল। কারণ এই বরাদ্দের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ, পরিকাঠামো উন্নয়ন— কোনও কিছুই সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী ঢাক পেটান— ‘বেটি পড়াও’। কত বরাদ্দ তাতে? ‘ন্যাশনাল স্কিম ফর ইনসেনটিভ টু গার্লস’-এর জন্য বরাদ্দ মাত্র ১ কোটি টাকা (২৫৬ কোটি ছিল ২০১৮-১৯-এ)। প্রসঙ্গত, ২০১৬-’১৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের দেশের ১ লক্ষ ৮ হাজারের বেশি স্কুলে একজন করে শিক্ষক আছেন।

এগুলির মধ্যে ৮৫,৭৪৩টি প্রাইমারি স্কুল। দেশের মাত্র ৫৪ শতাংশ স্কুলে শৌচাগার ও পানীয় জলের সুবিধা রয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি যথাযথ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল সমস্ত স্কুলে পানীয় জল, শৌচাগার সহ অন্যান্য ব্যবস্থা করার। অথচ সরকার তা করেনি। তারা এমনকি গত বাজেটের বরাদ্দ ১৪ হাজার ২২৩ কোটি টাকা খরচও করতে পারেনি!

স্কুলশিক্ষায় বরাদ্দ মাত্র ৫৪,৮৭৪ কোটি টাকা। দেশের ১০ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬৭৮ টি স্কুলের মধ্যে (১৪-০৯-২০২০ লোকসভায় প্রদত্ত তথ্য) অর্থমন্ত্রী মাত্র ১৫,০০০ টির পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা বলেছেন। কিন্তু তার জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ করেননি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১০০টি সৈনিক স্কুল খোলার প্রস্তাব রাখা হয়েছে বাজেটে। তবে এই স্কুলগুলি চলবে ব্যক্তিমালিক এবং এনজিও-র সাথে অংশীদারিত্বে। অর্থাৎ জনগণের অর্থে নির্মিত স্কুলে অবাধ মুনাফা লুট করার অধিকার দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি মালিকদের।

স্কুল পূর্ববর্তী শিক্ষা বা ‘প্রি-স্কুল এডুকেশন’ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এই বাজেটে। তাতে প্রযুক্তিনির্ভর ‘আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন’ (ইসিসিই)-র নিদান দেওয়া হয়েছে। অথচ এই প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত শিশু শিক্ষা দিতে পারার পরিকাঠামো তৈরি করার বরাদ্দ নেই বাজেটে। তাহলে এগুলি গড়তে পারবে কারা? ইতিমধ্যেই প্রি-স্কুলে বিনিয়োগ করা কর্পোরেট কোম্পানিগুলিই নয় কি? সরকার জাতীয় শিক্ষানীতিতে গ্রামীণ ‘প্রি-স্কুল’ শিক্ষার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কথা বলেছিল। কিন্তু বাজেটে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির ন্যূনতম পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কিছুই ঘোষণা করা হয়নি। ফলে নিঃসন্দেহেই প্রি-স্কুল শিশুশিক্ষা পুরোপুরি বেসরকারি মালিকদের হাতের মুঠোতেই আবদ্ধ হবে। আদিবাসী এলাকায় পূর্ণাঙ্গ স্কুলের বদলে এক শিক্ষকের ‘একলব্য’ স্কুল হবে। ফলে পিছিয়ে পড়া এলাকার ছাত্রদের শিক্ষা কার্যত প্রহসনে পরিণত হতে চলেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০-র সুপারিশ অনুযায়ী অনলাইন শিক্ষায় জোর দিতে ‘ডিজিটাল এডুকেশন আর্কিটেকচার’ তৈরির কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমিয়ে শিক্ষাকে ‘ডিজিটালাইজ’ করার প্রচেষ্টা শিক্ষার বেসরকারিকরণেরই একটি পদক্ষেপ মাত্র। এর ফলে অনলাইন শিক্ষা-বেচা কর্পোরেট কেম্পানি ও জিও-র মতো টেলিকম কোম্পানিগুলির বিপুল লাভ হবে। কিন্তু গরিব ঘরের ছাত্রছাত্রীরা ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, ল্যাপটপের খরচ জোগাতে না পেরে শিক্ষা থেকে দূরে চলে যাবে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মাত্র ৩৮,৩৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বাজেটে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে প্রস্তাব করেছেন, এই ঘাটতি মিটবে শিক্ষায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে। গবেষণার ক্ষেত্রে ‘ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন’ গড়ে সরকারই ঠিক করে দেবে কোন গবেষণা হবে, কোনটা নয়। সমস্ত ধরনের গবেষণার হাত-পা বেঁধে ফেলা হচ্ছে, যাতে গবেষণাকেও মালিক শ্রেণির মুনাফা লাভের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়। গবেষণার নামে ঐতিহ্যবাদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কূপমণ্ডুক চিন্তা, বিজ্ঞানের নামে কল্পবিজ্ঞানকে জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষানীতির মিষ্টি কথার আড়ালে আসলে যে রয়েছে বিজেপি সরকারের শিক্ষাকে ধ্বংস করার সার্বিক বেসরকারিকরণ ও কর্পোরেটকরণের গোপন অভিপ্রায়। এই কেন্দ্রীয় বাজেট এটাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

# কয়লার দাম কমেছে, বিদ্যুতের দাম কমাও দাবি গ্রাহক সমিতির

অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী ১২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, বিদ্যুতের জ্বালানি কয়লা সরবরাহকারী সংস্থা ভারত কোকিং কোল লিমিটেড (বিসিসিএল) প্রতিযোগিতার বাজারে সুবিধা করে দিতে ক্যাটিগরি অনুযায়ী কয়লার দাম ১০ থেকে ২৬ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে নতুন দাম ঘোষণা করেছে। এর ফলে বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ স্বাভাবিকভাবেই ভালোরকম কমবে। রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা যাতে মূল্যহ্রাসের সেই সুবিধা পান তা সুনিশ্চিত করতে বিদ্যুতের মাশুল কমাতে হবে।

তিনি বলেন, বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং রাজ্য সরকারকে দাবি মেনে মাশুল কমাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১৮ ফেব্রুয়ারি বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনকে সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

# সাহিনদের প্রাণ যায় সরকার নীরবই থাকে

বর্তমান সমাজ একটা প্রবাদবাক্য তোতাপাখির মতো আওড়ে সকলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে— ‘চাচা আপন প্রাণ বাঁচা’, ‘আপনি বাঁচলে বাপের নাম’। কিন্তু সহকর্মীদের বিপদে নিজের প্রাণ দিয়ে এ সমস্তকেই নস্যাৎ করে দিল দরিদ্র পরিবারের যুবক সাহিন। বানতলা চর্মনগরীতে নিকাশি নালায় কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়া সহকর্মীদের প্রাণ বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিলেন ঠিকা শ্রমিক সাহিন। সহকর্মীদের ‘বাঁচাও বাঁচাও’ চিৎকার শুনে স্থির থাকতে পারেননি তিনি। অভুক্ত পরিবার, ভবিষ্যৎ-এর পিছুটান কোনও কিছুই আটকে রাখতে পারেনি তাঁকে। কোনও নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়াই অন্ধকার গহ্বরে বিষাক্ত গ্যাসের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের উদ্ধার করেছে সে। কিন্তু দমবন্ধকর পরিবেশে বিষাক্ত গ্যাসের ছোবল থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি সাহিন। আটকে পড়ার দীর্ঘক্ষণ পর দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর জেসিবি মেসিন দিয়ে পাইপ ভেঙে তার নিষ্প্রাণ দেহ উদ্ধার করে।

বানতলা চর্মনগরীতে নতুন জল পরিশোধন প্ল্যান্ট তৈরি করছে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ)। তারা এই কাজের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করলেও তাদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই তাদের। তথাকথিত ‘উন্নয়নে’ শ্রমিকদের প্রাণ রক্ষার যে কোনও অ্যাজেন্ডা নেই— তা বানতলার ঘটনায় আরও একবার প্রকাশ্যে এল।

প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা— মুখে অক্সিজেন মাস্ক, কোমরে সেফটি বেল্ট, চোখে ওয়াটারপ্রুফ চশমা, মাথায় আলোযুক্ত হেলমেট— পাইপে ঢুকে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য কোনও কিছুরই ব্যবস্থা করেনি ঠিকাদার সংস্থা। মালিকরা জানে একেকটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর বিষয়টি নিয়ে একটু নাড়াচাড়া হবে, তারপর সব চাপা পড়ে যাবে। সরকারের জায়গা মতো নজরানা দিতে পারলেই সব ছাড়।

এর আগেও ম্যানহোল পরিষ্কার করতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসে দম আটকে রাজ্যের নানা প্রান্তে শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সরকার বা প্রশাসনের কোনও হেলদোল দেখা যায়নি। কেন বারবার ‘সাহিন’দের মর্মান্তিক মৃত্যু বরণ করতে হয়? আর কিছুমাত্র দায়িত্ব পালন না করে, শ্রমিকদের নিরাপত্তার ন্যূনতম বন্দোবস্ত না করে কর্তৃপক্ষ ছাড় পেয়ে যায়? একের পর এক ঘটনা ঘটে চলে, দোষীদের শাস্তি তো হয়ই না, কয়েক দিন পর প্রচারের আলো সরে গেলে ধামাচাপা পড়ে যায় শ্রমিক মৃত্যুর মর্মস্পর্শী ঘটনাও। দিনের পর দিন সরকার ও প্রশাসনিক অবহেলার কারণে দীর্ঘ হয়ে চলে অসহায় শ্রমিকের মৃত্যু-তালিকা।

অবিলম্বে প্রশাসনের উচিত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া এবং উপযুক্ত নিরাপত্তা ছাড়া কোনও শ্রমিককে ভূগর্ভে নামতে না দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। কিন্তু শুধু তাতেই এই মৃত্যু-মিছিল আটকানো যাবে না। দরকার সমাজ-মানসিকতা বদলের। মুনাফার লোভে ছুটে চলা এই পুঁজিবাদী সমাজে ক্ষমতাসীন সরকার, ক্ষমতাশালী দল এবং তাদের পেটোয়া কর্তাদের কল্যাণে শ্রমজীবী মানুষকে সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয় না, কিছু সংখ্যা হিসাবে দেখা হয়। সাহিনদের অকালে ঝরে যাওয়া তাদের কাছে একটা সংখ্যার বাড়া-কমা বৈ কিছু নয়। তাই বারবার এভাবেই মরতে হয় সাহিনদের। মানুষের ওপর মানুষের শোষণের ভিত্তিতে টিকে থাকা এই সমাজ নির্বাক হয়ে দেখতে থাকে সভ্যতার এই পিলসুজদের মর্মান্তিক মরণ।

# প্রধানমন্ত্রীর আবদার

*একের পাতার পর*

প্রধানমন্ত্রীর চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যুক্ত কৃষকরা, সাধারণ মানুষ, ছাত্র-বুদ্ধিজীবী সহ সমাজের সব স্তরের মানুষ তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। এই ধিক্কারের সামনে পড়ে প্রধানমন্ত্রী সাফাই গেয়েছেন, "কৃষক আন্দোলনকে পবিত্র বলেই মনে করি। কিন্তু সেই পবিত্রতা যারা নষ্ট করেন, তাঁরা আন্দোলনকারী নন, আন্দোলনজীবী।" বলেছেন, যাঁরা হাজতে বন্দি সন্ত্রাসবাদীদের ছবি বুকে লাগিয়ে কৃষকের কথা বলছেন, টোল প্লাজা দখল করছেন, পাঞ্জাবে টেলিফোনের তার ছিঁড়ছেন, তাঁরা কৃষক আন্দোলনের পবিত্রতা নষ্ট করতে চান।

গত প্রায় তিন মাস ধরে প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যে দু'শো জন কৃষক যে তিল তিল করে প্রাণ বিসর্জন দিলেন, তা প্রধানমন্ত্রীর চোখে পড়ল না। কোথায় দুটো টেলিফোনের তার ছিঁড়েছে, সেটাই তাঁর কাছে বড় হল। এমনই হয়। যুগে যুগে শাসকরা এমন করেই মানুষের দাবিকে দাবিয়ে রাখতে, সত্যকে চাপা দিতে এমন করেই তুচ্ছ জিনিসকে সামনে এনে বড় করে দেখায়। এমন ভাষাতেই মানুষের ন্যায্য দাবিতে গড়ে ওঠা প্রতিবাদের নিন্দা করে, তার নেতৃত্বের নামে মিথ্যা অভিযোগ তোলে। ব্রিটিশরা বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী বলেনি? ফলে প্রধানমন্ত্রী নতুন আর কী বলেছেন!

**প্রধানমন্ত্রী সংসদে বলেছেন, "ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ছিল, আছে, থাকবে।" তাঁর কথাই যদি সত্য হয়, তবে আইনে সে কথা লিখছেন না কেন? কৃষকরা তো সেটাই চাইছেন।**

কৃষকরা যে কোনও সন্ত্রাসবাদীর ছবি বুকে নিয়ে আন্দোলন করছেন না, তা প্রধানমন্ত্রীর অজানা নয়। কৃষকদের বুকে আছে ভগৎ সিং, সুভাষচন্দ্র, চন্দ্রশেখর আজাদ, আসফাকুল্লা, বিসমিলের ছবি। তাঁদের সংগ্রামের অনুপ্রেরণাই আন্দোলনকারীদের আজ এতখানি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলেছে। কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব যদি আন্দোলনজীবী হন, পরজীবী হন, তবে তো প্রধানমন্ত্রী ভগৎ সিং, সুভাষচন্দ্রদেরও পরজীবী বললেন! যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সুফল আজ ক্ষমতার গদিতে বসে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল ভোগ করছেন, সেই আন্দোলন কি নেতৃত্বহীন ছিল? অবশ্য প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেন, তাঁদের পূর্বসূরি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কিংবা হিন্দু মহাসভা কেউই সেই আন্দোলনে অংশ নেয়নি। ব্রিটিশকেই সহযোগিতা করেছিল।

অতীতের সব শাসকদের মতোই আজও সরকারের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে কোনও ভিন্ন মতকে, ভিন্ন সুরকেই রাষ্ট্রদ্রোহ, দেশদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদ হিসাবে দাগিয়ে দেওয়া এবং তার উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনাই বিজেপির রাজনীতি। সেই রাজনীতিই প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকার কৃষক আন্দোলন নিয়ে করছেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দেশের মানুষের সামনে তাঁদের সেই স্বৈরাচারী শাসকের চরিত্রকে, আন্দোলন বিরোধী, কৃষক বিরোধী চরিত্রকে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী যে মতলব থেকেই বলুন না কেন, আন্দোলনকারী কৃষকরা ভাল করেই জানেন, আন্দোলনজীবী কথাটি গৌরবেরই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনও প্রতিবাদের, আন্দোলনের পাশে এসে যাঁরা দাঁড়ান, তাঁরা মহৎ ব্যক্তি। যুগ যুগ ধরে মানুষ শাসকের, শোষকের শোষণ-অত্যাচারের শিকার হয়ে আসছে। তাঁদের জাগানোর, তাঁদের লড়াইয়ের পাশে দাঁড়ানোর কাজ তো এক মহান সামাজিক দায়িত্ব। আন্দোলনজীবীরা সেই দায়িত্বই পালন করছেন। আর যাঁরা আন্দোলন ভাঙে, আন্দোলনের নামে কুৎসা করে, যুগে যুগে মানুষ তাঁদের ঘৃণা করে এসেছে। প্রধানমন্ত্রীরা তাই আজ মানুষের শুধু ঘৃণাই কুড়োবেন। প্রধানমন্ত্রীর আবদার, শোষণ-বঞ্চনা চলবে, কিন্তু আন্দোলন চলবে না। বাস্তবে এমন কখনও ঘটে না। যত দিন শোষণ থাকবে ততদিন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং আন্দোলনও হবে।

আন্দোলনের নেতৃত্বকে বদনাম করতে করতেই প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে আইন সম্পর্কে পুরনো মিথ্যাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, বেসরকারি সংস্থার কাছে ফসল বেচতে বাধ্য করার কথা নতুন আইনে বলা হয়নি। কোনও অতি বড় স্বৈরশাসকও কি আইনে এমন কথা লিখতে পারে? প্রধানমন্ত্রীরা যদি এতই বোকা হতেন তবে ম্যানেজার হিসাবে তাঁদের আম্বানি-আদানিরা কখনওই বাছত না। ফলে সে কথা নিশ্চয়ই আইনের পাতায় তাঁরা লেখেননি। কিন্তু কৃষকরা এবং তাঁদের নেতারাও এতখানি বোকা নন যে, আইনের ফাঁকে এবং তার প্যাঁচে কী আছে, বা আইন প্রয়োগের ফল কী দাঁড়াবে, তা আগাম তাঁরা ধরতে পারবেন না।

প্রধানমন্ত্রী নতুন আইনের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে ঘোষণা করেছেন, "ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ছিল, আছে, থাকবে। সংসদে দাঁড়িয়ে বলছি।" প্রধানমন্ত্রী যদি এতই কৃষক দরদি, তবে সংসদে দাঁড়িয়ে যা এতখানি জোরের সঙ্গে বলছেন, তা আইনে এক লাইন লিখে দেওয়ার সাহস পাচ্ছেন না কেন? কেন তাঁরা এ ব্যাপারে জিদ করছেন? আসলে এর মধ্যেই আইনে কৃষকের ভাল করার মিথ্যাচারটি স্পষ্ট। একই সঙ্গে স্পষ্ট বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের ভণ্ডামিটিও।

প্রধানমন্ত্রী জানেন, সহায়ক মূল্য আইনসম্মত করে দিলে তাঁদের নতুন কৃষি আইন আনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। গোটা কৃষিক্ষেত্রটিকে যে আজ তাঁরা দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির অবাধ লুঠের জন্য খুলে দিতে চাইছেন, এ কাজের জন্য যে তাঁরা কর্পোরেট পুঁজির পায়ে দাসখত লিখে দিয়েই ক্ষমতায় বসেছেন, সে উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যাবে। সহায়ক মূল্য আইনসম্মত হলে কর্পোরেট লুঠেরাদের যথেচ্ছ শোষণ-লুণ্ঠনের পথে বাধা পড়বে। বিজেপির কর্পোরেট প্রভুরা তা মানবে না। কৃষকদের লাগাতার আন্দোলন তাই যেমন কর্পোরেট পুঁজিপতিদের তেমনই বিজেপি নেতাদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছে।

বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা আসলে কর্পোরেট পুঁজিপতিদের হাতে দম দেওয়া পুতুল। তারা যেমন চালায় এঁরা তেমনি চলেন। কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থই বিজেপি নেতাদের স্বার্থ। দেশের জনগণের স্বার্থের সাথে এঁদের কোনও সম্পর্ক নেই শুধু নয়, জনগণের স্বার্থকে কর্পোরেট তথা একচেটিয়া পুঁজির পায়ে বলি দেওয়ার জন্যই তাঁরা নিয়োজিত। বিজেপি পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী একটি দল। তাঁদের রাজনীতিতে, নীতিতে, আচরণে, সরকার পরিচালনায়, আন্দোলন দমনে, বাজেটে— সব কিছুতে প্রতিদিন তা প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

## জীবনাবসান

কলকাতার শ্যামপুকুর-কাশীপুর আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ পার্টি সংগঠক কমরেড রেণুকা রায়চৌধুরী ৩১ জানুয়ারি রাতে দলের টালা সেন্টারে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

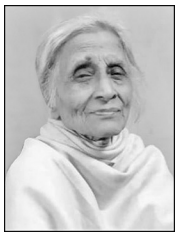

১৯৬৭ সাল নাগাদ বরানগরে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) পার্টির কর্মকাণ্ডের সাথে তিনি যুক্ত হন। দরিদ্র ঘরের সন্তান কমরেড রেণুকা রায়চৌধুরী জীবিকার প্রয়োজনে বরানগরের আলমবাজার এলাকায় একটি সরকারি দুগ্ধবিতরণ কেন্দ্রে কাজ করতেন। বরানগরই ছিল তাঁর আদি নিবাস।

দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত কমরেড দিলীপ শিকদার সরকারি দুগ্ধ বিভাগে কাজ করতেন। তাঁর সাথে পরিচয়ের সূত্রে কমরেড রেণুকা পার্টির আদর্শকে জানেন। তারপর তদানীন্তন রাজ্য কমিটির সদস্য ও বরানগর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড মণি চ্যাটার্জীর সাথে পরিচয় হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শ পেয়ে তিনি দলের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। ধীরে ধীরে দলের কাজকেই একমাত্র কাজ হিসাবে জীবনে গ্রহণ করেন। দল যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে দ্বিধাহীনভাবেই তা পালন করার চেষ্টা করেছেন। দলের নানা কাজের সাথে সাথে তিনি এলাকায় দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনে বরানগরের দলীয় দপ্তরে সান্ধ্য ক্লাস পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ও এলাকার মহিলাদের সংগঠিত করার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। দলের মুখপত্র, পত্রপত্রিকা প্রচার ও অর্থসংগ্রহের কাজ করতে গিয়ে বহু মানুষের সাথে পরিচিত হন ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। সে সময় বরানগরে সাধারণ মানুষের কাছে কমরেড রেণুকা রায়চৌধুরী এসইউসিআই(সি)-র প্রতিনিধি রূপে প্রতিভাত ছিলেন। দল পরিচালিত নানা গণআন্দোলনে ধারাবাহিকভাবে অংশগ্রহণ করেন ও বহুবার গ্রেপ্তার বরণ করেন। জনগণের প্রতি অসীম দরদবোধই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পার্টির অনুজ-অগ্রজ সকল কর্মীদের প্রতি প্রাণভরা ভালোবাসার মধ্য দিয়েই তাঁর জনদরদ প্রকাশ পেত।

কমরেড রেণুকা রায়চৌধুরী তাঁর ছোড়দার সাথে বসবাস করলেও সমস্ত ভাইবোনরাই তাঁকে খুব ভালবাসতেন। যদিও শেষপর্যন্ত দলের প্রয়োজনে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে টালা সেন্টারে বসবাস করতে শুরু করেন এবং উত্তর কলকাতায় দলের কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। বয়সজনিত কারণে দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকে সেন্টারেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুর পরদিন ১ ফেব্রুয়ারি সকালে তাঁর পুরনো কর্মস্থল বরানগর আঞ্চলিক অফিসে মরদেহ আনা হয়। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী, অমিতাভ চ্যাটার্জী, আঞ্চলিক কমিটির পূর্বতন সম্পাদক সাধন চক্রবর্তী, প্রবীণ সংগঠক কাজল ভট্টাচার্য সহ আঞ্চলিক কমিটির সকল সদস্য ও আঞ্চলিক বিভিন্ন গণসংগঠন, উপস্থিত বহু কর্মী ও তাঁর পরিচিত জনেরা শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করেন। শেষে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত ও কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আলমবাজার কেলভিন ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ ও দরদি কর্মীকে হারাল।

**কমরেড রেণুকা রায়চৌধুরী লাল সেলাম**

---

বীরভূম জেলার মুরারই লোকাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক কমরেড আবুল হোসেন ৩০ জানুয়ারি সকালে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে রামপুরহাট হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রামপুরহাটের দলীয় কর্মীরা হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। দলের জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটকের পক্ষে মাল্যদান করেন কমরেড গুণাধীশ দাস। মরদেহ বাড়িতে পৌঁছলে মুরারইয়ের কর্মীরা, তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও বহু সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

৬০-এর দশকে কমরেড আবুল হোসেন প্রয়াত নেতা কমরেড জিয়াদ বক্সির ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসে দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। তারপর থেকেই প্রায় নিয়মিত ভাবে দলের নানা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতেন। জেলা ও রাজ্যের নানা কর্মসূচিতে প্রায়ই অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি দলের খুব কাছে আসেন। পরবর্তী সময়ে কমরেড জিয়াদ বক্সির অসুস্থতার কারণে তাঁকেই রাজগ্রাম কোয়ারি ইউনিয়নের কাজকর্ম দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ওই কাজে যুক্ত ছিলেন এবং শ্রমিকদের নানা সমস্যা এবং দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছেন।

বেশ কিছুদিন তিনি উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারছিলেন না। তার মধ্যেও দলের খোঁজখবর রাখতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন বহুদিনের সাথীকে হারাল।

**কমরেড আবুল হোসেন লাল সেলাম**

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21



# ১৫-১৬ মার্চ ব্যাঙ্ক ধর্মঘট
## সফলের আহ্বান এ আই ইউ টি ইউ সি-র

ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম সহ অন্যান্য ব্যাঙ্ক সংগঠনের ডাকা ১৫ ও ১৬ মার্চের ধর্মঘট সফল করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড শঙ্কর সাহা ১০ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে জানান, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবারের বাজেটে দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সহ একটি বিমা কোম্পানি এবং বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বেসরকারিকরণের ঘোষণা করেছে। অথচ ব্যাঙ্ক থেকে পুঁজিপতিরা বিপুল পরিমাণে ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করার কারণেই ব্যাঙ্কগুলি রুগ্ন হয়ে পড়ছে। জনগণের টাকা আত্মসাৎকারী এই পুঁজিপতিদের নামের তালিকা সরকার প্রকাশ্যে আনছে না। বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে ব্যাঙ্কগুলিকে সেই পুঁজিপতিদেরই দেওয়া হবে, যারা ব্যাঙ্কের এই রুগ্নতার জন্য দায়ী। তারা ব্যাঙ্কে জমা জনগণের কষ্টার্জিত টাকা নিয়ন্ত্রণ করবে। এর ফলে অবধারিতভাবে গ্রাহক এবং কর্মচারীদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে।

পুঁজিপতিদের স্বার্থে আনা জনবিরোধী এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং জনগণকে আন্দোলনে এগিয়ে আসার এবং ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানান তিনি।

*পার্কিং ফি চড়া হারে বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুতে এসইউসিআই (সি) জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিশাল বিক্ষোভ সংগঠিত হয়, ১২ ফেব্রুয়ারি*

# অফলাইন শিক্ষা দ্রুত চালুর দাবিতে
## এ আই ডি এস ও-র বিক্ষোভ

৯ ফেব্রুয়ারি এমবিবিএস প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের অফলাইন ক্লাস চালুর দাবিতে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে প্রথম বর্ষের

কয়েকশো ছাত্রছাত্রীর স্বাক্ষর সহ স্মারকলিপি জমা দেয় এ আই ডি এস ও। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয় ৯ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলিতে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে। কিছু মেডিকেল কলেজে অফলাইনে ক্লাস শুরু হলেও কলকাতার প্রায় সবগুলি এবং বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে অনলাইন ক্লাস চলছে। ইতিপূর্বে কর্তৃপক্ষ অফলাইন ক্লাসের যৌক্তিকতা স্বীকার করে ছাত্রছাত্রীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন তবুও অফলাইন ক্লাস চালু করা হয়নি। এই অবস্থায় এ আই ডি এস ও বিভিন্ন কলেজে প্রিন্সিপাল, ডিরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। কিন্তু সমস্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ নীরব। একই স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একই কোর্স অফলাইন ও অনলাইন দুই ধরনের পদ্ধতিতে ক্লাস হওয়ায় বহু ছাত্রছাত্রী সমস্যায়। বিশেষত অ্যানাটমির মতো বিষয়ের সঠিক ধারণা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই নীতি বৈষম্যমূলক ও অনৈতিক। কোভিড প্যান্ডেমিকের কারণে ইতিমধ্যে শিক্ষাবর্ষ কমে ১১ মাস হয়েছে। তার উপর অনলাইন ক্লাস অত্যন্ত দায়সারা ভাবে করানো হচ্ছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা বিরক্ত, ক্ষুব্ধ এবং হতাশ। মেডিকেল সায়েন্সের মতো মানুষের জীবন নিয়ে কাজ করা একটি বিষয়ের পঠনপাঠন কখনও দায়সারা ভাবে করানো উচিত নয়। অথচ অতিমারির সময় থেকেই ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের ব্যাপারে রাজ্য সরকার ও স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত উদাসীনতা ও অপদার্থতা বার বার দেখা যাচ্ছে। জনজীবন অনেকটাই স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও যেমন এখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালু করা হচ্ছে না, একই ভাবে মেডিকেল শিক্ষাতেও হাতে কলমে শিক্ষার সুযোগ নষ্ট করা হচ্ছে। এগুলি সবই মেডিকেল শিক্ষাকে কোচিং ইন্ডাস্ট্রি নির্ভর এবং সার্বিক বেসরকারিকরণের পরিপূরক করে তোলার যে চক্রান্ত এনএমসি নিয়ে এসেছে তারই বাস্তব রূপ।

# আন্দোলনের সমর্থনে কৃষক সম্মেলন

**পূর্ব বর্ধমানে সম্মেলন ঃ** ১৩ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া শহরে রবীন্দ্র ভবনে এআইকেকেএমএস-এরপ্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দুইশতাধিকপ্রতিনিধির উপস্থিতিতে। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড পঞ্চানন প্রধান, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দনা গোস্বামী, এসইউসিআই(সি)-র জেলা সম্পাদক কমরেড অনিরুদ্ধ কুণ্ডু। কমরেড অরবিন্দ সাহাকে সভাপতি, মোজ্জাম্মেল হককে সম্পাদক করে ২৯ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয় (ছবি প্রথম পাতায়)।

**এগরায় ব্লক সম্মেলন ঃ** কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে ও দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে এবং কৃষকদের নানা দাবিতে ১২ ফেব্রুয়ারি কুদি বাজারে অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের এগরা ১ নং ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অনুপ জানা। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য নেতা কমরেড বিবেক রায় এবং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বলরাম দাস। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা নেতা কমরেড সনাতন গিরি। সম্মেলনে দাবি ওঠে, সমস্ত চাষির ধান চিনাবাদাম লঙ্কা সহ কৃষিপণ্য ন্যায্যমূল্যে সরকারি বাজারে ক্রয় করতে হবে, কুদিতে পান, চিনাবাদামের মান্ডি চালু করতে হবে, প্রতি অঞ্চলে ধান কেনার শিবির চালু করতে হবে, ধান কেনায় দুর্নীতি দলবাজি বন্ধ করতে হবে, কুদি-ছত্রি-বালিঘাই ক্যানাল সহ দুবদা বেশিনের সমস্ত খাল সংস্কার করতেহবে। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড জগদীশ সাউ। কমরেড প্রদীপ মাইতিকে সম্পাদক এবং কমরেড অনুপ জানাকে সভাপতি করে ৩১ জনের এগরা ব্লক-১ কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে তিন শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

# স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতির দাবি আশাকর্মীদের

*ফরম্যাট প্রথা বাতিল সহ গুরুত্বপূর্ণ ১২ দফা দাবিতে ৮ ফেব্রুয়ারি হাওড়া জেলার আমতা স্টেশনের কাছে আমতা-১ ব্লকের আশাকর্মীদের একটি সভা হয়। এই ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের আশাকর্মীরা তাঁদের বঞ্চনার কথা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। মূল বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের হাওড়া গ্রামীণ জেলার সভাপতি নিখিল বেরা ও রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন। সভা থেকে ১৪ জনকে নিয়ে ব্লক কমিটি গঠিত হয়।*

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com